শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম

স্বামী সর্বাত্মানন্দ

অপ্রমেয়ো হৃষীকেশঃ পদ্মনাভোঽমরপ্রভুঃ।
বিশ্বকর্মা মনুস্ত্বষ্টা স্থবিষ্ঠঃ স্থবিরো ধ্রুবঃ ॥১৯

শাংকরভাষ্য : শব্দাদিরহিতত্বান্ন প্রত্যক্ষগম্যঃ, নাপ্যনুমানবিষয়ঃ, তদ্ব্যাপ্তলিঙ্গাভাবাৎ। নাপ্যুপমানসিদ্ধঃ নির্ভাগত্বেন সাদৃশ্যাভাবাৎ। নাপ্যর্থাপত্তিগ্রাহ্যঃ, তদ্বিনানুপপদ্যমানস্যাসম্ভবাৎ। নাপ্যভাবগোচরো ভাবত্বেন সম্মতত্বাৎ। অভাবসাক্ষিত্বাচ্চ ন ষষ্ঠপ্রমাণস্য। নাপি শাস্ত্রপ্রমাণবেদ্যঃ প্রমাণজন্যাতিশয়াভাবাৎ। যদ্যেবং শাস্ত্রযোনিত্বং কথম্? উচ্যতে প্রমাণাদিসাক্ষিত্বেন প্রকাশস্বরূপস্য প্রমাণাবিষয়ত্বেঽপি অধ্যস্তাতদ্রূপনিবর্তকত্বেন শাস্ত্রপ্রমাণকত্বমিতি *অপ্রমেয়ঃ* সাক্ষি রূপত্বাদ্ বা।

হৃষীকাণীন্দ্রিয়াণি, তেষামীশঃ ক্ষেত্রজ্ঞরূপভাক্। যদ্বা, ইন্দ্রিয়াণি যস্য বশে বর্তন্ত স পরমাত্মা *হৃষীকেশঃ* যস্য বা সূর্যরূপস্য চন্দ্ররূপস্য চ জগৎপ্রীতিকরা হৃষ্টাঃ কেশা রশ্ময়ঃ স হৃষীকেশঃ; 'সূর্যরশ্মির্হরিকেশঃ পুরস্তাৎ' ইতি শ্রুতেঃ। পৃষোদরাদিত্বাৎসাধুত্বম্। যথোক্তং মোক্ষধর্মে—

সূর্যাচন্দ্রমসৌ শশ্বদংশুভিঃ কেশসংজ্ঞিতৈঃ।
বোধয়ন্ স্বাপয়ংশ্চৈব জগদুত্তিষ্ঠতে পৃথক্ ॥
বোধনাৎস্বাপনাচ্চৈব জগতো হর্ষণং ভবেৎ।
অগ্নীষোমকৃতৈরেবং কর্মভিঃ পাণ্ডুনন্দন।
হৃষীকেশো মহেশানো বরদো লোকভাবনঃ ॥

(মহাভারতম্, শান্তিপর্ব ৩৪২।৬৬-৬৭) ইতি।

সর্বজগৎকারণং পদ্মং নাভৌ যস্য স *পদ্মনাভঃ*, 'অজস্য নাভাবধ্যেকমর্পিতম্' ইতি শ্রুতেঃ। পৃষোদরাদিত্বাৎসাধুত্বম্। অমরাণাং প্রভুঃ *অমরপ্রভুঃ*।

বিশ্বং কর্ম ক্রিয়া যস্য স *বিশ্বকর্মা*। ক্রিয়ত ইতি জগৎকর্ম বিশ্বং কর্ম যস্যেতি বা, বিচিত্রনির্মাণশক্তিমত্ত্বাদ্বা বিশ্বকর্মা; *ত্বষ্টা* সাদৃশ্যাদ্বা। মননাৎ *মনুঃ*। 'নান্যোঽতোঽস্তি মন্তা' (বৃহদারণ্যক ৩।৭।২৩) ইতি শ্রুতেঃ। মন্ত্রো বা প্রজাপতির্বা মনুঃ। সংহারসময়ে সর্বভূততনূকারণত্বাৎ *ত্বষ্টা* ত্বক্ষতেস্তনূকরণার্থাৎ তৃচ্ প্রত্যয়ঃ। অতিশয়েন স্থূলঃ *স্থবিষ্ঠঃ*।

পুরাণঃ স্থবিরঃ 'ত্বেকং হ্যস্য স্থবিরস্য নাম' ইতি বহ্বৃচাঃ; বয়োবচনো বা স্থিরত্বাদ্ ধ্রুবঃ *স্থবিরো ধ্রুব* ইত্যেকমিদং নাম সবিশেষণম্।

ভাষ্যানুবাদ : সংস্কৃত অভিধানে 'মা' শব্দ 'না বাচক', সাধারণত প্রতিষেধ অর্থেই ব্যবহৃত হয়। যেমন আমরা বলি, 'অপ্রিয়ং মা বদঃ'—অপ্রিয় বোলো না। ক্রিয়া হিসেবে ব্যবহৃত হলে মা-ধাতুর প্রয়োগ হবে পরিমাপ বা measurement অর্থে। যেমন পরিমাপ (পরি+মা+ ল্যুট) অথবা অনুমান (অনু+মা+ল্যুট) ইত্যাদি। আক্ষরিক অর্থে এই বিচার বা সঠিক নির্ধারণকে আমরা বলি 'প্রমা'। 'প্র' অর্থাৎ প্রকৃষ্ট, 'মা' অর্থাৎ নির্ধারণ। জন্মলগ্ন থেকেই এই

'প্রমা' আমাদের জীবনের সঙ্গী, প্রমার হাত ধরেই আমাদের জীবনের পথ চলা। শৈশবে জ্ঞান হতেই শিশু যা পায় তাই মুখে দেয়, কারণ জীবনের প্রারম্ভিক লগ্নে 'ক্ষুধা' ছাড়া অন্য কোনও বোধ তার নেই, তার প্রমা কেবলমাত্র রসনা-ইন্দ্রিয়ের বোধেই বোধিত। বয়সের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটতে থাকে পরিবেশ(জগৎ)-এর সঙ্গে নিত্যনতুন বোধের আদানপ্রদানের মাধ্যমে। তার নিজস্ব প্রমার সীমাই হয়ে ওঠে তার জগৎ। ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠে প্রমাতা, জগৎ হয়ে ওঠে প্রমেয়, প্রমার প্রকরণ বা scale-কে বলি প্রমাণ। এইভাবে প্রমাতা-প্রমাণ-প্রমেয়র ত্রিপুটিতেই জীবন আবর্তিত হয় বা জীবনের সত্যতা নির্ধারিত হয়। সোজা কথায় প্রমা-ই জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই পিতামহ ভীষ্ম বলেছেন 'ধাতুরুত্তম' (পূর্বের শ্লোকের অন্তিম সম্বোধন)। যে 'সর্বব্যাপী চৈতন্য' তাকে প্রাকৃত অর্থে প্রমার বিষয় করা যায় না বা objectify করা যায় না, তিনি 'অপ্রমেয়'। গীতার প্রারম্ভেই শ্রীভগবান বলেছেন, 'অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।/ অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য...'' ইত্যাদি (২।১৮)। কথামৃতে শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরকে বলছেন, ''ব্রহ্ম যে কি, মুখে বলা যায় না। সব জিনিস উচ্ছিষ্ট হয়ে গেছে। বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, ষড় দর্শন—সব এঁটো হয়ে গেছে! মুখে পড়া হয়েছে, মুখে উচ্চারণ হয়েছে—তাই এঁটো হয়েছে। কিন্তু একটি জিনিস কেবল উচ্ছিষ্ট হয় নাই, সে জিনিসটি ব্রহ্ম। ব্রহ্ম যে কি, আজ পর্যন্ত কেহ মুখে বলতে পারে নাই।'' জ্ঞানসংকলিনী তন্ত্রে আছে, ''উচ্ছিষ্টং সর্বশাস্ত্রাণি সর্ববিদ্যা মুখে মুখে।/ নোচ্ছিষ্টং ব্রহ্মণো জ্ঞানমব্যক্তং চেতনাময়ম্॥''

শাংকর অদ্বৈতদর্শনে নির্গুণ ব্রহ্মের লক্ষণ নিরূপণ করা হয় নেতি নেতি বিচারে। ভাষ্যকার এখানে সেই আভাস দিচ্ছেন যে লৌকিক দৃষ্টিতে আমরা কোনও বস্তুকে বা সত্তাকে স্বীকার করে নিই সাধারণত ছটি প্রমাণের দ্বারা :

১। প্রত্যক্ষ প্রমাণ—ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি বা জ্ঞান, যেমন আমরা বলি, এটা গাছ, ওটা নদী। কিন্তু ব্রহ্মকে এভাবে বলা যায় না। ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়গম্য নয়, ব্রহ্ম অপ্রত্যক্ষ তত্ত্ব।

২। অনুমান প্রমাণ—সরাসরি চোখে হয়তো দেখছি না কিন্তু অনুমান করছি, যেমন বলে থাকি, 'পর্বতো বহ্নিমান্'—কারণ পাহাড়ে আগুন দেখতে না পেলেও ধোঁয়া তো দেখছি! আগুন না থাকলে ধোঁয়া আসবে কোথা থেকে? এখানে ধোঁয়াকে দর্শনের পরিভাষায় বলা হয় 'ব্যাপ্তলিঙ্গ' বা চিহ্ন। ব্রহ্মের ক্ষেত্রে কোনও 'ব্যাপ্তলিঙ্গ' পাওয়া যায় না।

৩। উপমান প্রমাণ—ব্রহ্ম সর্বব্যাপী এক অখণ্ড সত্তা। তাই এর সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য কিছু হতে পারে না। সাদৃশ্য বা অসাদৃশ্যের জন্য কমপক্ষে দুটি বস্তু চাই। দুই না হওয়ায়, ব্রহ্ম অমুকের মতো বা তমুকের মতো নয়, এভাবে বোঝানো যাবে না। অর্থাৎ উপমা দিয়ে ব্রহ্মের লক্ষণ করা যাবে না, উপমানের বিষয় নয় পরব্রহ্ম।

৪। অর্থাপত্তি লক্ষণ—কারণ এবং কার্যের অসামঞ্জস্য থেকেও আমরা কখনও কোনও সিদ্ধান্ত নিই, যেমন 'অমুক দিনে খায় না কিন্তু মোটা হচ্ছে, এটা তো হতে পারে না, ভোজন (কারণ) বিনা মেদবৃদ্ধি (কার্য) অসম্ভব (তদ্ বিনা তদ্ অসম্ভব), সুতরাং সে নিশ্চয়ই রাত্রে খায়। নির্গুণব্রহ্মের সত্তার প্রমাণ এভাবেও হতে পারে না, কারণ নির্গুণব্রহ্মের কোনও কারণ বা কার্য নেই।

৫। অনুপলব্ধি প্রমাণ—কোনও বস্তুর কোনও স্থানে উপলব্ধির অভাবকে ধরে নিয়ে অন্যত্র তার প্রমাণকে মানা হয়। একে 'প্রতিযোগী অভাব' বলে। কিন্তু ব্রহ্মের কোনও অভাব নেই, 'নাভাবো বিদ্যতে সতঃ' (গীতা ২।১৬)। অনুপলব্ধি প্রমাণ দ্বারাও ব্রহ্মের নিরূপণ হবে না।

অভাবেরও সাক্ষী হওয়ায়, ষষ্ঠ প্রমাণও ব্রহ্মের নির্ধারণে ব্যর্থ। অর্থাৎ যে-ছয়টি প্রমাণ দ্বারা আমরা লৌকিক জগতের কোনও সত্তা বা অস্তিত্বকে স্বীকার করি, সেইগুলি দ্বারা ব্রহ্মকে বোঝাতে পারি না।

ভাষ্যকার প্রশ্ন তুলছেন, যদি সংশয় ওঠে যে প্রমাণ-দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ধারণ অসম্ভব বলে শাস্ত্রপ্রমাণও অযোগ্য? তাহলে ব্রহ্মসূত্রে ব্রহ্মকে 'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ' (১।১।৩) কেন বলা হল? ভাষ্যকার বলছেন, সেক্ষেত্রে উত্তর হবে, প্রকাশস্বরূপ ব্রহ্ম সমস্ত লৌকিক প্রমাণ, সত্তা-র অধিষ্ঠান বা সাক্ষীরূপে স্থিত। অনাত্মজগৎ ব্রহ্মে অধ্যস্ত বা আরোপিত। তাই অধ্যস্তজগতকে বা আরোপিতজগতকে বিচারদ্বারা বাধিত করে সাক্ষিচৈতন্যরূপেই ব্রহ্ম-উপলব্ধি হতে পারে। প্রমাণের বিষয় না হওয়ায় ব্রহ্ম-উপলব্ধি বিধিমুখে হওয়া অসম্ভব। নিষেধমুখে অর্থাৎ ইতরব্যাবৃত্তি দ্বারাই একমাত্র শুদ্ধব্রহ্মের উপলব্ধি হতে পারে।

এই প্রমাণের সীমাবদ্ধতাকে শ্রীরামকৃষ্ণ অপরূপ ভাষায় বলেছেন, "একজন সাগর দেখে এলে কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে, কেমন দেখলে, সে লোক মুখ হাঁ করে বলে,—'ও! কি দেখলুম! কি হিল্লোল কল্লোল!' ব্রহ্মের কথাও সেইরকম।"

"বই পড়ে কি জানবে? যতক্ষণ না হাটে পৌঁছান যায়, ততক্ষণ দূর হতে কেবল হো-হো শব্দ। হাটে পৌঁছিলে আর-একরকম...।"

হৃষীকেশ—হৃষীক মানে ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়বর্গের (পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ কর্মেন্দ্রিয়, মন-বুদ্ধি-চিত্ত-অহংকার) কর্তা, স্বামী বা ঈশ্বর—হৃষীকের ঈশ তাই তিনি হৃষীকেশ। গীতাতে স্পষ্টভাবে শ্রীভগবান বলছেন, "ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত" (১৩।৩)—সকলক্ষেত্রেরই দ্রষ্টা ক্ষেত্রজ্ঞ এক। ক্ষেত্রজ্ঞ ক্ষেত্র থেকে পৃথক, স্বতন্ত্র। আমাকে সেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলে জানবে। ক্ষেত্র অর্থাৎ দেহ, ক্ষেত্রর স্বামী ক্ষেত্রজ্ঞ।

মহাভারতের শান্তিপর্ব (৩৪২।৬৬-৬৭) থেকে আরও একটি 'হৃষীকেশ' শব্দের ব্যাখ্যা এনেছেন ভাষ্যকার। ব্যাখ্যাটি চিত্রকল্পের মতো সরল, অভিনব। কবির কল্পনায় সূর্য এবং চন্দ্রমার বিচ্ছুরিত কিরণমালা যেন স্রষ্টার কেশের মতো ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত বিশ্বে, দিনে রাত্রে। নিত্য প্রভাতে সূর্যের কেশসদৃশ কিরণমালা জাগিয়ে তোলে সংসারকে, নিশীথে চন্দ্রমার কেশরাশির স্নিগ্ধস্পর্শে ঘুমিয়ে পড়ে জগৎ। সংসারকে 'হৃষ্ট' করে বা প্রফুল্লিত (হৃষ্ ধাতু হর্ষ অর্থে) করে, 'হৃষ্ট ওই কেশ যাঁর' তিনি হৃষীকেশ অর্থাৎ বহুব্রীহি সমাস অনুসারে নারায়ণ হচ্ছেন হৃষীকেশ।

ব্যাকরণের দৃষ্টিতে 'হৃষ্ট কেশ যাঁর' তিনি 'হৃষ্টকেশ' হবেন, যেমন শঙ্খপাণি। হৃষীকেশ কী করে হলেন? ভাষ্যকার বলছেন, না, এটি অশুদ্ধ নয়, পাণিনিমতে এটি পৃষোদরাদিগণের অন্তর্ভুক্ত। (এ-সম্পর্কে ১৬ নং শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।)

পদ্মনাভ—পদ্ম নাভিতে যাঁর। যাঁর নাভিতে জগৎকারণরূপ পদ্ম অর্পিত তিনি পদ্মনাভ। পুরাণে বর্ণিত আছে ব্রহ্মার সৃষ্টি নারায়ণের নাভিকমল থেকে। ভাষ্যকার শ্রুতির উল্লেখ করছেন, 'অজস্য নাভাবধ্যেকমর্পিতম্।' শ্রীমদ্ভাগবতেও এই তথ্যটি পাই (১।৩।২)—"যস্যাম্ভসি শয়ানস্য যোগনিদ্রাং বিতন্বতঃ।/ নাভিহ্রদাম্বুজাদাসীদ্ ব্রহ্মা বিশ্বসৃজাং পতিঃ॥"—যোগনিদ্রাগত ঈশ্বরপুরুষের গর্ভোদকের নাভিকমল থেকে লোকপিতামহ ব্রহ্মা প্রকট হলেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণের শ্রীশ্রীদুর্গাসপ্তশতীতে (শ্রীচণ্ডী) মেধসমুনি বলছেন, "স নাভিকমলে বিষ্ণোঃ স্থিতো ব্রহ্মা প্রজাপতিঃ"—বিষ্ণুর নাভিকমলে স্থিত পিতামহ ব্রহ্মাজী মধুকৈটভকে দেখলেন ইত্যাদি...।

এখানেও ভাষ্যকার বলছেন, সমাস অনুযায়ী (পদ্ম নাভিতে যাঁর) পদটি পদ্মনাভি হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু বহুল প্রয়োগে 'পদ্মনাভ' শব্দটিই গৃহীত হয়েছে, পাণিনিমতে এ-ও পৃষোদরাদিগণভুক্ত।

অমরপ্রভু—ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস, অর্থাৎ অমরগণের প্রভু। অমর অর্থাৎ অমৃতপানকারী দেবতা। পুরাণে সর্বদাই পাই, দেবাসুর সংগ্রামে যখনই দেবতারা পরাজিত হয়েছেন, তখনই পিতামহ ব্রহ্মাজীকে নিয়ে তাঁরা চলেছেন বৈকুণ্ঠে, এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ভগবান নারায়ণ তাঁদের রক্ষা করছেন, আশ্রয় দিচ্ছেন। ভাগবতে (৮।৯।২৮) শুকদেবজী প্রসঙ্গ করছেন যে দেবতাদের দেবত্ব বা অমরত্বের কারণও ভগবান বিষ্ণু। সমুদ্রমন্থনের দ্বারা যে-অমৃত উঠেছিল সেই অমৃত তিনি সযত্নে সুরক্ষিত রেখেছেন, কৌশলে অসুরদের মোহাবিষ্ট করে তাঁদের ভোগদৃষ্টি থেকে সরিয়ে এনে দেবতাদের পান করিয়েছেন। তাই বিষ্ণু অমরগণের প্রভু। শ্রীধরস্বামী ওই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলেছেন, ''যস্য পাদপঙ্কজরজঃ শ্রয়ণাদ্ দেবা অমৃতম্ ফলমাপুঃ স এব সেব্যঃ''—যাঁর চরণাশ্রয় করে দেবতারা অমৃতত্ব পেলেন, তিনিই একমাত্র সেব্য, পূজ্য। সেই নারায়ণই সর্বজনের আশ্রয়।

গীতার ধ্যানে পাই, 'যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈঃ'—নিত্য দেবতারা যাঁর স্তুতি করছেন, সেই নারায়ণকে প্রণাম।

বিশ্বকর্মা—এই জগৎ বা বিশ্বরূপ কর্ম যাঁর তিনি বিশ্বকর্মা। অথবা তিনি বিচিত্রনির্মাণশক্তিতে সম্পন্ন বলে নিরন্তর তাঁর কর্ম, বিচিত্র তাঁর কর্ম। গীতায় ভগবান বলছেন, তিন লোকে (তিন কালেও) তাঁর কোনও কর্তব্য নেই, কোনও অপ্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তব্যও নেই, তবুও নিরন্তর কর্মে তিনি অতন্দ্রিত—''ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।/ নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি॥'' (৩।২২)

মনু, ত্বষ্টা এগুলি কর্মীর উদাহরণ। গীতাতে ভগবান 'কর্ম' এবং 'লোকসংগ্রহ' প্রসঙ্গে জনকাদি কর্মীর উদাহরণ যেমন দিয়েছেন—'কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ', তেমনই এখানেও জগৎকর্মযজ্ঞের নায়করূপে উচ্চারিত হয়েছে মনু, ত্বষ্টা প্রভৃতি পার্ষদবর্গের নাম। ভাষ্যকার বলছেন, যিনি মননশীল তিনি মনু। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৩।৭।২৩) বলা হয়েছে 'নান্যোঽতোঽস্তি মন্তা'—যাজ্ঞবল্ক্য এবং উদ্দালক সংবাদে বর্ণিত হয়েছে তিনিই সেই অন্তর্যামী অমৃত (নারায়ণতত্ত্ব) যিনি সমস্ত মননশীলতার কেন্দ্রবিন্দুতে, যিনি সমস্ত মননের সাক্ষীস্বরূপ, যেখান থেকে সমস্ত সংকল্পের সৃষ্টি—'যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী' (গীতা ১৫।৪)।

পৌরাণিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা চোদ্দোজন মনুকে পাই যাঁরা নারায়ণের সৃষ্টিকার্যের সহায়ক, মানুষের পূর্বপুরুষ, প্রতিনিধি, হিতৈষী—এঁরাই প্রজাপতি নামে খ্যাত। প্রথম মনুকে স্বায়ম্ভুব মনু বলা হয়, যিনি মনুস্মৃতির প্রবক্তা। সপ্তম মনুকে আমরা বলি বৈবস্বত মনু, কারণ বিবস্বান বা সূর্য থেকে এঁর সৃষ্টি। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এঁরই উল্লেখ করে বলছেন, ''এই ব্রহ্মবিদ্যা যোগরহস্য আমি সূর্যকে শিখিয়েছিলাম, সূর্য সেই বিদ্যা তাঁর পুত্র মনুকে, মনু আবার পুত্র ইক্ষ্বাকুকে বলেছিলেন''—''ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবান-হমব্যয়ম্।/ বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবে-হব্রবীৎ॥'' (গীতা, ৪।১)

মনুকে যদি নারায়ণের রজোগুণের প্রতীক (সৃষ্টিবৈচিত্র্য বা প্রজাবৃদ্ধির অর্থে) ধরা যায় তাহলে ত্বষ্টাকে ভাবতে হবে তমোগুণের অর্থে। ত্বক্ষ্ ধাতুতে তৃচ্ প্রত্যয় যোগে 'ত্বষ্টা' শব্দ তনূকরণ বা ক্ষীণকরণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। ভাষ্যকার বলছেন, প্রলয়ে সমস্ত প্রাণীর সংহারকর্তা তিনি, তাই তিনিই ত্বষ্টা। পুরাণে আমরা এক ত্বষ্টাচরিত্র পাই, তিনি দেবকুলের কারিগরি বিভাগের অধিকর্তা। জানা যায়, ত্বষ্টার কন্যা ছিলেন সংজ্ঞা, সূর্যের স্ত্রী। তিনি সূর্যের প্রখর তেজ সহ্য করতে না পারায় ত্বষ্টা সূর্যের প্রভামণ্ডলকে কেটেছেঁটে সহনীয় করে দেন।

দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যেও ত্বষ্টা নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। অনেক পণ্ডিতের মতে মনু,

ত্বষ্টা এঁরা নারায়ণের বিশ্বকর্মার ভাবের প্রতিনিধি।

'স্থবিষ্ঠ' শব্দের উৎপত্তি 'স্থা' ধাতু থেকে। 'স্থবিষ্ঠ', 'স্থবির' পরস্পর সমার্থক শব্দ দৃঢ়, স্থির অর্থে। স্থূল (মোটা) শব্দের বা পদের সঙ্গে 'ইষ্ঠন' প্রত্যয় যোগে স্থবিষ্ঠ শব্দের উৎপত্তি। অর্থাৎ অত্যন্ত স্থূল কোনও বস্তুকে স্থবিষ্ঠ বলা যেতে পারে।

কঠোপনিষদে ব্রহ্মের লক্ষণ করা হয়েছে 'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান'—এই আত্মা সূক্ষ্মের থেকে সূক্ষ্মতর এবং বৃহতের থেকেও বৃহত্তর। এই দুটি বিপরীত তত্ত্বের (সূক্ষ্ম এবং বৃহৎ) বৃহৎ-ভাবটি প্রকাশক হিসেবে যখন আমরা নারায়ণের বিভিন্ন অবতাররূপের অনুধ্যান করি, তখন মৎস্য ও কূর্ম অবতারের কথা মনে হয়। মৎস্যাবতারে দেখতে পাই কীভাবে একটি ছোট্ট মৎস্য তার কলেবর বৃদ্ধি করেছে, রাজর্ষি সত্যব্রত-র অঞ্জলিমধ্যস্থ ছোট্ট মৎস্য কীভাবে রাজাকে ছলনা করছেন, রাজা তাকে যেখানে রাখছেন, সেই স্থানই মৎস্যের পক্ষে অপরিমিত হচ্ছে। অবশেষে রাজা তাঁকে জিজ্ঞাসা করছেন : "মৎস্যরূপে আপনি আমাদের বিমোহিত করছেন, আপনি কে?"—"কো ভবানস্মান্ মৎস্যরূপেণ মোহয়ন্?" (ভাগবত ৮।২৪।২৫)

ভাগবতে বর্ণিত হয়েছে যে সমুদ্রমন্থনের সময় মন্দারপর্বত সাগরজলে নিমগ্ন হলে নারায়ণ যোজনবিস্তৃত এক বিশাল কূর্মরূপে জলমধ্যে প্রবেশ করলেন এবং আধারশূন্য মন্দারপর্বতকে নিজের পিঠে স্থাপন করলেন। শুকদেবজীও সেই কচ্ছপ-শরীরকে বলছেন 'কচ্ছপমদ্ভুতং মহৎ' (৮।৭।৮)।

বামন অবতারেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি—'তদ্বামনং রূপমবর্দ্ধতাদ্ভুতম্' (তদেব, ৮।২০।২১)।

খর্বাকৃতি ব্রাহ্মণবালক বামনরূপী নারায়ণ দৈত্যরাজ বলিকে সামান্য ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করেছিলেন। প্রতিশ্রুতিপাশে বদ্ধ বলি দেখলেন বামনের বর্ধিত রূপ, 'মহতো মহীয়ান্' বিষ্ণুর একপদে ভূলোক, শরীর দ্বারা আকাশদিকসকল এবং দ্বিতীয় পদ দ্বারা স্বর্গধাম অধিকৃত। তৃতীয় পদক্ষেপ এখনও বাকি! প্রতিশ্রুত ভূমি দান করতে অসমর্থ বলিরাজ মাথাটি পেতে দিলেন। বামনদেব তাঁর মস্তকে পাদস্থাপন করে তাঁকে নরকে পাঠিয়ে দিলেন।

পিতামহ ভীষ্ম যেন বলতে চাইছেন, হে যুধিষ্ঠির, 'অণোরণীয়ান্' এবং 'মহতো মহীয়ান্' দুটি বিপরীত তত্ত্ব। একথার তাৎপর্য এই, তিনি অণুও নন, মহৎ-ও নন। এই যে ক্ষুদ্র-বৃহৎরূপে তাঁকে অনুভব করছি, নানান বিকৃতি, পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে দেখছি, তাঁর প্রকৃত স্বরূপ জানলে দেখব এই পরিবর্তনশীলের পিছনে তিনি এক অপরিবর্তনশীল সত্তারূপে রয়েছেন যাঁর ওপরে পরিবর্তনগুলি আরোপ মাত্র (বেদান্তের পরিভাষায় অধ্যাস বা বিবর্ত), আগন্তুক ধর্ম—আসছে যাচ্ছে, তিনি কোনওটাই নন।

এই অপরিবর্তনীয় তত্ত্বটি বোঝানোর জন্য ভীষ্মের পরবর্তী সম্বোধন 'স্থবির, ধ্রুব'। তিনি স্থির—অবিকারিত্বই তাঁর স্বভাব। ধ্রুবত্বই তাঁর লক্ষণ। ভাষ্যকার বলছেন স্থবির মানে পুরাতন, ভাষ্যকারের মতে স্থবির শব্দ ধ্রুবের বিশেষণ। 'ধ্রুব' নামটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে নারায়ণের প্রিয় বালকভক্ত ধ্রুব-র একটি স্তুতি, প্রসঙ্গত ভাগবতে (৪।৯।১৬) ধ্রুব আক্ষরিকভাবে এই তত্ত্বের কথাই বলছেন—"যস্মিন্ বিরুদ্ধগতয়ো হ্যনিশং পতন্তি বিদ্যাদয়ো বিবিধশক্তয় আনুপূর্ব্যা।/ তদব্রহ্ম বিশ্বভবমেকমনন্তমাদ্যমানন্দমাত্রমবিকার-মহং প্রপদ্যে॥"—পরস্পরবিরুদ্ধ ভাবাপন্ন বিদ্যাদি, বিভিন্ন শক্তি সর্বদা যাঁতে হঠাৎ হঠাৎ প্রকাশিত হয়, বিশ্বের সেই অনাদি-অনন্ত-অবিকারী-অদ্বিতীয় কারণকে প্রণাম, আনন্দঘন পরব্রহ্মের স্বরূপ আপনার শরণ নিই। *(ক্রমশ)*